সমকালীন বৈশ্বিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ইসলামের ভবিষ্যৎ

SHAHED
AL HIKMAH MEDIA

সমকালীন বৈশ্বিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ইসলামের ভবিষ্যৎ

অনুবাদ

আল-হিকমাহ অনুবাদ টিম

সমকালীন বৈশ্বিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ইসলামের ভবিষ্যৎ

- **অনুবাদ :** আল-হিকমাহ অনুবাদ টিম
- **প্রথম প্রকাশ**
  রজব, ১৪৪৭ হিজরী | জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

- **স্বত্ব :** সকল মুসলিমের জন্য সংরক্ষিত

- **প্রকাশক : আল-হিকমাহ মিডিয়া (**আল-কায়েদা উপমহাদেশ, বাংলাদেশ হালাকা)
- **চ্যানেল লিংক:**
  https://talk.gnews.to/channel/al-hikmah-media
  https://chirpwire.net/alhikmahmedia

নোট: মূল প্রকাশনাটি 'আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ শাখা (AQAP)' এর অফিসিয়াল মিডিয়া আউটলেট 'শাহেদ' (আল-মালাহিম মিডিয়ার একটি সার্ভিস) কর্তৃক ১৪৪৭ হিজরীর রজব মাসে প্রকাশিত হয়।

একজন সম্মানিত ভাই কর্তৃক লিখিত 'মুস্তাকবালুল ইসলাম ফি জিল্লিত তাহাওউলাতিল আলামিয়্যাহ আল-মুআসিরাহ' (مستقبل الإسلام في ظل التحولات العالمية المعاصرة) নামক প্রকাশনাটির বাংলা অনুবাদ এখন প্রকাশিত হচ্ছে।

স্বত্ব

এই বইয়ের স্বত্ব সকল মুসলিমের জন্য সংরক্ষিত। পুরো বই, কিংবা কিছু অংশ অনলাইনে (পিডিএফ, ডক অথবা ই-পাবসহ যেকোনো উপায়ে) এবং অফলাইনে (প্রিন্ট অথবা ফটোকপি ইত্যাদি যেকোনো উপায়ে) প্রকাশ করা, সংরক্ষণ করা অথবা বিক্রি করার অনুমতি রয়েছে। আমাদের অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই। তবে শর্ত হলো, কোনো অবস্থাতেই বইয়ে কোনো প্রকার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন, বিয়োজন করা যাবে না।

- **কর্তৃপক্ষ**

সমকালীন বৈশ্বিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ইসলামের ভবিষ্যৎ

আমরা চাই বা না চাই—আজকের এই পৃথিবী, যেখানে আমাদের বসবাস, তা পরিবর্তন হচ্ছে এবং গড়িয়ে পড়ছে এক তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে। যদি সেই যুদ্ধের 'শীতল' লক্ষণগুলো (Cold War) এবং 'উত্তপ্ত' প্রস্তুতিগুলো (Hot Preparations) ইতিমধ্যে শুরু হয়ে না-ও থাকে, তবুও এটি এমন এক ধ্রুব সত্য ও বাস্তবতা, যা আমরা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করছি এবং যার মধ্যে আমরা বসবাস করছি। এটি কোনো অনুমান নির্ভর ভবিষ্যৎ-বাণী নয়, যা পরে সত্য হতে পারে; বরং প্রতিটি ইঙ্গিত, ইশারা, এমনকি চোখের পলকও সেই অনিবার্য পরিণতির দিকেই নির্দেশ করছে। সভ্যতার সংঘাত আজ দিগন্তে উঁকি দিচ্ছে, সবদিকে বেজে উঠছে যুদ্ধের দামামা এবং আকাশে ধীরে ধীরে ঘনীভূত হচ্ছে সেই যুদ্ধের কালো মেঘ।

আর আজ আমরা অবলোকন করছি—পৃথিবীর আনাচে-কানাচে মহামারী ছড়িয়ে পড়ছে, যা কেড়ে নিচ্ছে লক্ষ-কোটি প্রাণ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ—আগ্নেয়গিরি, ভূমিকম্প, বন্যা ও খরা—যেন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। চলছে প্রারম্ভিক যুদ্ধের এক দীর্ঘ ধারাবাহিকতা, সাথে বাণিজ্যিক নৌপথগুলো বিচ্ছিন্ন করার পায়তারা। পরাশক্তিগুলোর মধ্যে উস্কানি ও হয়রানি ক্রমশ বাড়ছে এবং দুর্বলদের ওপর তাদের দমন-পীড়ন সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এর বিপরীতে, ইহুদী-খ্রিস্টান ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে আজ মুসলিম উম্মাহ এবং বিশ্বজুড়ে ক্ষোভ দানা বাঁধছে, আর ইসলামী জিহাদি কাফেলার অগ্রগামী দলগুলোর প্রতিও জনগণের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দৃশ্যমান হচ্ছে।

এই সবকিছু এবং আরো নানাবিধ কারণ মিলে জন্ম দিয়েছে এক শ্বাসরুদ্ধকর অর্থনৈতিক সংকটের। বিশ্বজুড়ে মুদ্রাস্ফীতি মহামারী আকার ধারণ করেছে। এর সাথে যদি আমরা যোগ করি ব্যবসায়ীদের লোভ, ভোগের বিলাসিতা এবং সমাজ ব্যবস্থার এমন এক বিভাজন—যেখানে একদল অঢেল সম্পদের মালিক আর অন্যদল চরম দারিদ্র্য ও অভাবের শিকার; এবং সেই সাথে (সরকারপন্থী) আলেম-উলামা-দাঈ, চিন্তাবিদ, সংসদ সদস্য, নির্বাহী কর্মকর্তা ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ওপর থেকে যদি মানুষের আস্থা হারিয়ে যাওয়ার বিষয়টি যুক্ত করি; আর রাষ্ট্রগুলো যখন অশ্লীলতা ও নাস্তিকতার প্রচার এবং আধ্যাত্মিক চেতনার বিনাশ সাধনে মত্ত হয়ে রাষ্ট্রীয় গোলকধাঁধায় পথ হারায়—তখন এই সবকিছু মিলে পৃথিবীকে এক সামাজিক, নৈতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে দাঁড় করিয়ে দেয়। পৃথিবী এগিয়ে যাচ্ছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে, আর জনগণ এগিয়ে যাচ্ছে দুর্নীতিপরায়ণ স্বৈরাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে বিপ্লবের দিকে। যারা তাদেরকে শিকল পরিয়ে রেখেছে এবং লজ্জা, অপমান ও লাঞ্ছনার গ্লানি দিয়েছে, জনগণ অচিরেই তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবে।

আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই মহাযুদ্ধগুলো ধেয়ে আসছে। যুদ্ধ-পরবর্তী বাস্তবতায় পৃথিবী বদলে যেতে বাধ্য। যারা ভবিষ্যতের জন্য উত্তম প্রস্তুতি গ্রহণ করবে, তারাই এই আসন্ন যুদ্ধের ফসল ঘরে তুলবে। এই প্রেক্ষাপট দাওয়াত, ইলম ও জিহাদের সাথে সংশ্লিষ্টদেরকে আহ্বান জানাচ্ছে—যেন তারা আরও অধিক হিম্মত এবং সঠিক ও নির্ভুল বুঝ-জ্ঞান নিয়ে প্রস্তুতির কাজ চালিয়ে যান। কারণ, সামনের যুদ্ধগুলো আমাদের কল্পনার চেয়েও ভয়াবহ হবে এবং এর মাধ্যমে বিশ্বের মানচিত্র বদলে যাবে। আর আমরা—মুজাহিদ বাহিনী—আমাদের এই পথচলায় আমাদের প্রিয় উম্মাহর উপস্থিতি ও সঙ্গ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন মনে করি।

এজন্য আমাদের সবচেয়ে বেশি যা প্রয়োজন তা হলো: আমাদের এবং আমাদের উম্মাহর সাধারণ জনগণকে একই সমতলে (Common Ground) নিয়ে আসা। এটি একটি ঐতিহাসিক সুযোগ, যা আমাদের অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যকার এই সংঘাত, তাদের উভয়কেই দুর্বল করে দেবে। আর এই সংঘাতের ছায়াতলে, অনেক জাতি তাদের শাসকদের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে মুক্ত হবে—তা বিপ্লবের মাধ্যমে হোক, সশস্ত্র লড়াইয়ের মাধ্যমে হোক অথবা রাজনৈতিক সমঝোতার মাধ্যমেই হোক।

একারণেই, যারা বৈশ্বিক জিহাদি প্রতিরোধের ডাক দেয় (যাদের লক্ষ্য দাওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমে ইসলামের বিজয়ের দিকে পরিবর্তন আনা) এবং যারা ধর্মনিরপেক্ষ, জাতীয়তাবাদী ও দেশাত্মবোধক মতাদর্শ লালন করে—তাদের মধ্যে এক বিশাল প্রতিযোগিতা শুরু হবে। আমাদের এমন দাওয়াতি ও সামরিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে, যা ধাপে ধাপে বিকশিত হয়ে এই সমস্ত জাহেলি মতবাদকে নিরপেক্ষ করে দেবে, দুর্বল করে ফেলবে এবং সম্ভব হলে সমূলে উৎপাটন করবে।

'জাতীয় অংশীদারিত্ব' কিংবা 'যৌথ দায়বদ্ধতা'-এর নামে এদের সাথে জোটবদ্ধ হওয়া একটি মারাত্মক ভুল ও পাপ। আমাদের নিজেদের এবং অন্যদের অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। মিসরে যখনই স্বৈরাচারী শাসনের পতন হলো, তখনই জাতীয়তাবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলো ইখওয়ানুল মুসলিমীনের (মুসলিম ব্রাদারহুড) সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল এবং সেনাবাহিনীর সহায়তায় তাদের ওপর চড়াও হলো। তাদের দৃষ্টিতে ইখওয়ান একটি মধ্যপন্থী দল থেকে তথাকথিত 'সন্ত্রাসী' দলে পরিণত হলো এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে পরিবর্তনের সকল পথ সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ হয়ে গেল। এরপর আল্লাহর মুজাহিদ বান্দাদের জন্য তাঁর সাহায্যের আশা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না। প্রাচীন প্রবচনে যথার্থই বলা হয়েছে:

لا يتسع الغمد لسيفين

অর্থাৎ, 'এক খাপে দুই তলোয়ারের জায়গা হয় না'।

সুতরাং, যারা জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র অথবা কওমিয়তের ভিত্তিতে ইসলামের দাবি করে, তাদের প্রতি আমাদের কখনোই সুধারণা পোষণ করা উচিত নয়। কারণ এরা সকলেই প্রকারান্তরে পাশ্চাত্যের সেবা করে এবং ইসলামের বিরোধিতা করে। তাই এদের থেকে সতর্ক থাকতে হবে। এদের সাথে কোনো জোট করা যাবে না, কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়া যাবে না, কিংবা নিরাপত্তা দেওয়া যাবে না। বরং তাদের প্রচেষ্টাকে কাজে লাগিয়ে তাদের মতাদর্শের ত্রুটিগুলো জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে। এরপর তাদের শক্তি খর্ব করা, তাদের কাতার ভেঙে দেওয়া, তাদের ঐক্য ছত্রভঙ্গ করা এবং বৈশ্বিক জিহাদি ও সংস্কারমুখী দাওয়াতের জাবহাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে তাদের নির্মূল করার কাজ করতে হবে। অবশেষে, সংঘাত যদি তাদের অনুকূলে যায় তবে তারা আমাদের সাথে যে আচরণ করত (যেমনটি মিসরে ঘটেছে), আমাদেরও তাদের সাথে ঠিক একই আচরণ করতে হবে।

তবে মনে রাখতে হবে, আমাদের এই আচরণ হবে আমাদের দ্বীনের ন্যায়বিচার ও আমাদের মানহাজের (পদ্ধতির) ভারসাম্যপূর্ণ নীতি অনুসারে। পরিবর্তনের আগে, পরিবর্তন চলাকালীন এবং পরিবর্তনের পরে—সর্বাবস্থায় আমাদের কাতারে দ্বীনদার মানুষ এবং উম্মাহর সাধারণ জনগণকে সমবেত করতে হবে, যাতে আমরা ইসলামের ক্ষমতায়ন করতে পারি এবং দ্বীনকে ঠিক সেভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারি, যেভাবে আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন ও সন্তুষ্ট হন।

গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে শুরা কাউন্সিলগুলোর আলোচনার অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল: আমাদের উম্মাহর মধ্যে আমেরিকানদের 'কোমল শক্তি' (Soft Power)-এর প্রভাব বিস্তার ও প্রবৃদ্ধি এবং আগামী প্রজন্মের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা। সেই সময়ে জিহাদের পথের পথিকদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এই নতুন প্রজন্ম ইহুদী-খ্রিস্টান পশ্চিমা শক্তির আমাদের প্রতি শত্রুতার আসল স্বরূপ কখনোই অনুধাবন করতে পারবে না; বরং তারা শত্রুর হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হবে। তাই জিহাদি দাওয়াতের ধারক-বাহকদের দায়িত্ব ছিল এই প্রজন্মকে তাদের গাফলতি অথবা উদাসীনতা থেকে জাগিয়ে তোলা।

ইসলামী দাওয়াত আজ প্রবল মিডিয়া ও রাজনৈতিক প্রচারণার সম্মুখীন। শত্রুদের এবং স্থানীয় শাসকগোষ্ঠীর হাতে জনগণের কাছে পৌঁছানোর জন্য যে বিশাল প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা রয়েছে, মুজাহিদদের হাতে তা নেই। অনেক ক্ষেত্রেই জিহাদপন্থীদের হাতে থাকা সামান্য উপায়-উপকরণকেও সংকুচিত করে দেওয়া হয়। যদিও ইসলামী জাগরণ বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তবুও জনমত গঠনের চাবিকাঠি মুজাহিদদের হাতের বাইরেই ছিল। এমতাবস্থায় সশস্ত্র সংঘাত ছাড়া শত্রুকে থামানো এবং আমাদের উম্মাহকে জাগিয়ে তোলার আর কোনো পথ খোলা ছিল না।

এ প্রসঙ্গে একটি স্বীকৃত সত্য হলো, আফগানিস্তানের জিহাদ ছিল—আল্লাহ তাআলার তাওফীকের পর—উম্মাহকে গভীর ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলার অন্যতম প্রধান মাধ্যম। এটি বর্তমান যুগের মুসলিম উম্মাহর লড়াকু অগ্রসেনা ও অশ্বারোহীদের যাত্রার জন্য এক শক্ত পাটাতন তৈরি করে দিয়েছে। প্রজন্মের এই জাগরণ এবং সংঘাতের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারাটা ছিল আমেরিকা ও ইহুদী-খ্রিস্টান পাশ্চাত্যের সাথে যুদ্ধের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

আল-কায়েদার প্রতি আল্লাহ তাআলার বিশেষ তাওফীক ছিল যে, তারা আমেরিকাকে তার 'কোমল শক্তি' (Soft Power)-এর লড়াই থেকে বের করে এনে 'রূঢ় শক্তির' (Hard Power) সংঘাতে জড়িয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। এই জাগরণের ব্যাপ্তি, উম্মাহর সীমানা ছাড়িয়ে অন্যদের মাঝেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এমনকি চীনের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা কয়েক বছর আগে বলেছিলেন: "আল-কায়েদা পশ্চিমাদের সাথে এক কঠিন সংঘাতে লিপ্ত রেখে, চীন ও রাশিয়া উভয়কেই তাদের পুনর্গঠন ও বিশ্বনেতৃত্বের প্রতিযোগিতায় ফিরে আসার জন্য যথেষ্ট সময় এনে দিয়েছে।" এটি অত্যন্ত গভীর চিন্তার দাবি রাখে, এমন একটি মন্তব্য।

তবে আমরা মুজাহিদরা বলি: "আল-কায়েদা মুসলিমদেরকে বিশ্ব-মঞ্চের লড়াইয়ে এবং বৈশ্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতিযোগিতায় আবারও ফিরিয়ে এনেছে।" এই বাক্যটি আমাদের এবং আমাদের উম্মাহর জন্য অনেক বড় অর্থ বহন করে। আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায়, আর মাত্র কয়েক দশক; এরপরই বৈশ্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে পশ্চিমারা তাদের শ্রেষ্ঠত্ব হারাবে। পশ্চিমারা সব ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছে। তারা বিশ্বকে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার মতো কিছুই দিতে পারেনি; বরং দিয়েছে সম্পদের ওপর সীমাহীন লোভ আর সুযোগসন্ধানী মানসিকতা। তারা উপহার দিয়েছে এক মানবিক ও আত্মিক দেউলিয়াত্ব। তারা সম্পদের অপচয় করেছে এবং পুরো গ্রহটিকে দূষিত করেছে। তারা মানবসত্তা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। তাই রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা থেকে পশ্চিমাদের বের করে দেওয়া এবং বিশ্ব-নেতৃত্ব থেকে তাদের সরিয়ে দেওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করা অপরিহার্য, যেন ইসলামের দুটি ঘোড়া—'দাওয়াত' ও 'জিহাদ'—এর জন্য ময়দান উন্মুক্ত হয়ে যায়।

আর সম্প্রতি আবির্ভূত হয়েছে সেই নির্বোধ জলদস্যু ট্রাম্প, যে কিনা সকল ময়দানে বৈশ্বিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করছে:

অভ্যন্তরীণভাবে: সে তার ব্যক্তিগত স্বপ্ন ও বিভ্রমের মধ্যে বসবাস করছে, আমেরিকার প্রথম 'রাজা' হওয়ার খোয়াব দেখছে। তাই ধারণা করা হচ্ছে, সে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য যেকোনো অজুহাতে আগামী নির্বাচন বাতিল করার চেষ্টা করবে অথবা সংবিধান পরিবর্তন করবে। আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায়, এই 'ব্ল্যাকমেইলার জলদস্যু' তার দেশকে এমন এক গৃহযুদ্ধ ও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে জড়িয়ে ফেলবে, যা বৈশ্বিক সিদ্ধান্তের ওপর আমেরিকার আধিপত্যকে দুর্বল করে দেবে। আর তার মতোই স্বপ্নবিলাসী নেতানিয়াহু— সেও একই কাজ করছে এবং ইহুদীদের রাজা হওয়ার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। কোনো জাতির অভ্যন্তরীণ ভাঙন থেকে তাকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় হলো, তার সংঘাতকে বাইরে স্থানান্তর করা; বিশেষ করে সেই জাতি যদি এমন হয়, যাদের ভিত্তি 'ধর্ম' নয় বরং 'স্বার্থ'। বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামরিক সংঘাতের কয়েক শতাব্দী ধরে তারা আমাদের এবং অন্যান্য জাতির সাথে এই কাজটিই করে এসেছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার মেহেরবানীতে এবং ইসলামের ওপর আমাদের অবিচলতার কারণে আমরা রক্ষা পেয়েছি। অন্যদিকে, 'মাদুরো' এবং ল্যাটিন আমেরিকার রাজারা তাদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক শূন্যতার কারণে ব্যর্থ হয়েছে; আর এভাবেই সমস্ত অন্তঃসারশূন্য জাতি ব্যর্থ হবে।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে: ট্রাম্প আমেরিকার শক্তির ধারণাকে তার মিত্রদের কাছে সফট পাওয়ার (Soft) ও হার্ড পাওয়ারের (Hard) রূপ থেকে বের করে এনে এক 'নির্লজ্জ শক্তির' (Bullying Power) পর্যায়ে নিয়ে গেছে। সে মাদুরোকে অপহরণের হুমকি দিয়েছে এবং তার পেছনের ল্যাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রপ্রধানদেরও শাসিয়েছে। সে আরব রাজাদের নির্লজ্জভাবে বলেছে: "আমরা বিনে পয়সায় কাউকে রক্ষা করব না... সুরক্ষার বিনিময়ে তোমাদের অবশ্যই মূল্য চুকাতে হবে।" এই বিষয়টি শুধু মুসলিম শাসক অথবা দুর্বল মিত্রদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা ইউরোপ এবং ন্যাটোর (NATO) সদস্য দেশগুলো পর্যন্ত গড়িয়েছে। এমনকি ইউক্রেন, যারা রাশিয়া থেকে ইউরোপ ও পশ্চিমাদের রক্ষার প্রথম প্রতিরক্ষা লাইন হিসেবে কাজ করে, তারাও রেহাই পায়নি। 'আমেরিকাকে মহান করো' (Make America Great Again) এবং 'সবার আগে আমেরিকা' (America First)—এই স্লোগানগুলো আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় সমগ্র পশ্চিমা সভ্যতার পতনের বাস্তবে রূপ নেবে।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে (প্রতিপক্ষ ও প্রতিযোগীদের সাথে): আমেরিকা এতদিন টেবিলের নিচ দিয়ে যা করত, ট্রাম্প তা প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছে। সে পৃথিবীর সবাইকেই হুমকি দিচ্ছে এবং যার মধ্যেই প্রতিরোধের ইচ্ছা দুর্বল দেখছে, তাকেই ব্ল্যাকমেইল করছে। সে আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘকে ধ্বংস করার কাজ করছে এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শাসন—অর্থাৎ 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতি—পুনঃপ্রতিষ্ঠা করছে। সে ভেনিজুয়েলার শাসক মাদুরোকে তার সেনাবাহিনী ও প্রহরীদের মাঝখান থেকে অপহরণ করেছে, এরপর কিউবা, ইরান এবং অন্যদের হুমকি দিয়েছে। ট্রাম্প হুবহু ঔপনিবেশিক গুন্ডাতন্ত্রের ন্যায় 'জঙ্গলের আইন' প্রয়োগ করছে। যারা ঔপনিবেশিক যুগ দেখেনি, তারা আজ 'ধ্বংসাত্মক উপনিবেশবাদ'-এর আসল চেহারা দেখবে। ট্রাম্প প্রতিদিন বিশ্বকে, তার কর্মীদের, সাংবাদিকদের এবং নিজের পরিবারকে যত হুমকি দেয়, তা গণনা করা কঠিন। সে ক্ষমতা কুক্ষিগত করা এবং রাজত্ব পাওয়ার নেশায় উন্মাদ। কেউ যদি নিজের কিছু লক্ষ হাসিল করতে চায়, তবে তার উপায় হলো, ট্রাম্পের তোষামোদ করা এবং তাকে নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার জন্য সমর্থন দেওয়া। অথচ সে কীভাবে তা পাবে, যখন সে সকাল-সন্ধ্যা বিশ্বকে হুমকি দিচ্ছে? ল্যাটিন আমেরিকার দুর্বলদের বিরুদ্ধে সে পাশবিক শক্তি প্রয়োগ করছে এবং উপসাগরীয় দেশগুলোর সম্পদ লুণ্ঠন করছে। সে তার 'প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়' (Defense Department)-এর নাম বদলে 'যুদ্ধ মন্ত্রণালয়' (War Department) করেছে—তা দেশের ভেতরের যুদ্ধ হোক কিংবা বাইরের—যাতে সবাই তার ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করে। সে একজন 'আনুগত্য পাওয়া আহমক', যা সর্বযুগের তাগুত কিংবা স্বৈরাচারদের অবস্থা হয়ে থাকে।

চীন প্রসঙ্গ: বিশ্বমঞ্চে প্রথম প্রতিযোগী 'চীন' তার নিজস্ব কৌশল অনুযায়ী কাজ করছে। তার লক্ষ হলো বিশ্বের সকল শক্তিকে দুর্বল করা—তা বস্তুগত শক্তি হোক কিংবা আধ্যাত্মিক। এ কারণেই চীন দুর্বলদের আরও দুর্বল করে, সবাইকে অর্থায়ন করে, সবার সাথে এবং সবার বিরুদ্ধে জোট বাঁধে। সে বিশ্বকে দেখাতে চায় যে, সে কেবল একটি বিশাল বাণিজ্যিক কারখানা নয়, বরং এমন এক জাতি যারা বিশ্বকে শাসন ও পরিচালনা করতে চায়। কিন্তু তার সেই স্বপ্ন সুদূর পরাহত! চীন নিজেকে গুটিয়ে রাখার (Isolation) মানসিকতায় রঞ্জিত। এক শাসকের উচ্চাভিলাষ অন্য শাসকের সতর্কতায় ভেস্তে যাবে। আল্লাহতে বিশ্বাস এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কিছুই চীনকে তার এই মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতা থেকে বের করতে পারবে না।

আমরা জোর দিয়ে বলছি যে, চীন, এমনকি রাশিয়া, ইরান ও তুরস্ক—এবং যারা বাহ্যিকভাবে পশ্চিমাদের বিরোধিতা করে—তারা আমাদের সাথে কখনোই প্রকৃত মৈত্রী গড়তে পারবে না। তারা কেবল আমাদের প্রচেষ্টাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে চায়। আমরা বর্তমান পর্যায়ে তাদের সাথে সংঘাতে জড়াব না, যতক্ষণ না তারা গায়ে পড়ে আমাদের ওপর চড়াও হয়। তবে তারা—ভবিষ্যৎ সংঘাতের আঁচ পেয়ে—দেরি করবে না আমাদের শত্রুদের সহায়তা করতে এবং আমাদের কাতার ভেঙে দিতে। কেউ কেউ হয়তো আমাদেরকে লোকদেখানো সামান্য সহায়তা দেবে খুব সতর্কতার সাথে, যা তাদের দৃষ্টিতে আমাদেরকে কেবল 'বাঁচিয়ে রাখবে' যাতে পশ্চিমাদের সাথে আমাদের সংঘাত চলতে থাকে এবং পশ্চিমারা দুর্বল হয়। কিন্তু তাদের এই সহায়তা আমাদের ভবিষ্যতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার শক্তি দেবে না। তাই তাদের বিশ্বাস করা যাবে না, তাদের ওপর নির্ভরও করা যাবে না। বরং আমাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সংঘাত পরিচালনা করতে হবে প্রজ্ঞা ও সচেতনতার সাথে, একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলার ওপর তাওয়াক্কুল করে এবং আমাদের উম্মাহর দ্বীনপরায়ণ সাধারণ মানুষের ওপর আস্থা রেখে।

মুসলিম বিশ্বের (আরব ও অনারব) শাসকদের কাজ কী? তাদের ক্ষমতার গদিতে টিকে থাকার বিনিময়ে, তাদের ওপর কী কী আদেশ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা বাস্তবায়ন করা তাদের জন্য বাধ্যতামূলক?

আরব তাগুত এবং মুসলিম নামধারী শাসকদের কাজ হলো—তাদের দেশগুলোকে আসন্ন বিদেশি দখলদারীর জন্য প্রস্তুত করা। ভুল কৃষি ও অর্থনৈতিক নীতির মাধ্যমে তাদের দেশগুলোকে দরিদ্র করে রাখা, যাতে জনগণ একের পর এক সংকটে নিমজ্জিত হয়ে হতাশায় ডুবে যায়। তাদের দায়িত্ব হলো, রিযিকের পথ সংকীর্ণ করে, সামাজিক অবক্ষয় সৃষ্টি করা, যাতে বিবাহ কঠিন হয়ে পড়ে এবং মানুষ অশ্লীলতার মাধ্যমে কামনাবাসনার নিবৃত্তি খোঁজে। পারিবারিক কাঠামো ধ্বংস করা। জনগণকে অস্ত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে শক্তিহীন করা এবং যুদ্ধের বিষয়টি এমন এক বাহিনীর হাতে ন্যস্ত করা, যাদের 'চিন্তা কিংবা নির্বাচন' করার জন্য নয় বরং কেবল 'আনুগত্য' করার জন্য প্রোগ্রামিং (Brainwash) করা হয়েছে। শিল্পকারখানাগুলো হতে হবে ভোগপণ্য-নির্ভর, উন্নয়নমূলক নয়—যাতে জাতি সবসময় পশ্চিমাদের ওপর নির্ভরশীল থাকে এবং তাদের প্রযুক্তির কাছে নতজানু থাকে; ফলে তাদের সফট পাওয়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, তাদের উপস্থাপিত সবকিছু সহজেই গ্রহণ করে নেয়।

তাদের আরও দায়িত্ব হলো—ইসলামী শিক্ষা ও তরবিয়ত ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা এবং ইসলামী বিচার ব্যবস্থাকে চূর্ণ করে দেওয়া, যাতে অজ্ঞতা ছড়িয়ে পড়ে এবং তাদের কাছ থেকে শরীয়তের বৈধতা (Legitimacy) কেড়ে নেওয়া হয়। শাসকদের কাজ হলো—নেতৃত্বের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের পরিপক্ক হওয়ার আগেই হত্যা করা, যাতে অভিজ্ঞতা হারিয়ে যায় এবং প্রজারা অভিভাবকহীন হয়ে পড়ে। যাতে ইমারত কিংবা কাঠামো তার ভিত্তি হারায়, কোনো অভিভাবক তথা আশ্রয় না থাকে, প্রতিরক্ষার কোনো শক্তি না থাকে, শিক্ষা দেওয়ার মতো কোনো কলম না থাকে, আর চেতনার

যুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো কোনো জিহ্বা অথবা ভাষা অবশিষ্ট না থাকে। পরিবেশটা এমনভাবে তৈরি করা হয়, যেন তা অভাব ও দারিদ্র্যে পূর্ণ থাকে এবং সমাজ যেন এক অভিভাবকহীন গোলকধাঁধায় হারিয়ে যায়।

এভাবেই দেশকে শ্বাসরোধ করা হয় এবং জনগণের শ্বাসরোধ করা হয়। আমাদের পূর্বপুরুষদের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের পর, শত্রুদের সার্বিক কৌশলটি যুগে যুগে এভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো চলে গেছে ঠিকই, কিন্তু তারা তাদের আবর্জনা (এজেন্টদের) পেছনে রেখে গেছে, সেই কাজগুলো করার জন্য, যা তারা নিজেরা করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ইসলামের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ এবং শক্তি প্রয়োগ করে তার ভূমি দখল করার অভিজ্ঞতা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে এবং পৃথিবীতে তাদের কর্তৃত্ব স্থায়ী হয়নি। তাই এখন তাদের এজেন্টরা, তাদের ভাড়াটে প্রচারক ও মিডিয়ার মাধ্যমে মুসলিমদেরকে তার দ্বীন থেকে দূরে সরানোর (পাশ্চাত্যায়ন) কাজ করছে। এমনকি দেশপ্রেম কিংবা জাতীয়তাবোধকেও তারা তরল করে ফেলছে এবং তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা নিয়োজিত করছে গাইরত (মর্যাদাবোধ) নষ্ট করতে ও ইতিহাসকে বিকৃত করতে।

সমকালীন এই বৈশ্বিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ইসলাম ও জিহাদের ভবিষ্যৎ অনেকগুলো সঠিক সিদ্ধান্ত ও ফ্যাক্টরের ওপর নির্ভর করছে, যা ইসলামের অনুসারী, আলেম সমাজ, দাঈ এবং মুজাহিদদের অত্যন্ত দায়িত্বশীলতা ও গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করতে হবে। প্রস্তুতির কাজগুলো, সঠিক বন্দোবস্ত এবং তরবিয়ত (প্রশিক্ষণ), সামরিক, দাওয়াতি ও রাজনৈতিক—সকল ময়দানে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমেই আল্লাহর ইচ্ছায় এই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে।

তাই ইসলামের জন্য কাজ করা প্রতিটি কর্মীর উচিত—এই কর্মযজ্ঞে তার অবস্থান কী (অর্থাৎ তার ভূমিকা কী) তা জানা এবং সেই অনুযায়ী প্রস্তুতি গ্রহণ করা। সৎকর্ম ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে একে অপরকে সহযোগিতা করা এবং রব্বানি আলেম ও একনিষ্ঠ দাঈদের সাথে পরামর্শ করা অপরিহার্য। যাত্রাপথকে সঠিক দিশা দিতে এবং কাফেলাকে পথ দেখাতে উম্মাহর সন্তানদের মাঝে সঠিক সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া জরুরি।

আর এসবের আগে, মাঝখানে এবং পরে—সবচেয়ে বড় অবলম্বন হলো আল্লাহ তাআলার কিতাব ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা, এই দুটিকে মজবুতভাবে ধারণ করা এবং এদের রক্ষায় লড়াই করা। সমস্ত তাওফীক কেবল তাদের জন্যই, যারা মহান আল্লাহ তাআলার সাথে থাকে এবং যারা আল্লাহ তাআলার দ্বীনের প্রকৃত সাহায্যকারী।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ ۖ فَآمَنَت طَّائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَّائِفَةٌ ۖ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ

অনুবাদ: “হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যাও, যেমন মারইয়াম-পুত্র ঈসা হাওয়ারীগণকে (শিষ্যদের) বলেছিলেন, ‘আল্লাহর পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে?’ হাওয়ারীগণ বলল, ‘আমরাই আল্লাহর সাহায্যকারী।’ অতঃপর বনি ইসরাঈলের একদল ঈমান আনল এবং একদল কাফের হয়ে গেল। তখন আমি ঈমানদারদেরকে তাদের শত্রুদের মোকাবেলায় শক্তিশালী করলাম, ফলে তারা বিজয়ী হলো।” [সূরা আস-সাফ ৬১:১৪]